সক্ষমতার ডানায় আকাশে শান্তির নীড়

জাতির স্বাধীনতা ও স্বার্বভৌমত্বের প্রতীক জাতীয় পতাকা বহন করে চলেছে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। একটি মাত্র ডিসি-৩ উড়োজাহাজ নিয়ে সদ্য স্বাধীন দেশে জাতির পিতার হাত ধরে যাত্রা শুরু করা বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের বহরে যুক্ত হয়েছে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির ড্রিমলাইনার উড়োজাহাজ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্যোগে একটি থেকে ২১টিতে উন্নীত হয়েছে বিমানের বহর। জীর্ণতা ছেড়ে দক্ষিণ এশিয়ার অন্যতম তারুণ্যদীপ্ত বহর হিসেবে সুপরিচিতি লাভ করেছে বাংলাদেশ বিমান। গত ২০২১-২০২২ অর্থবছরে অতীতের সব রেকর্ড অতিক্রম করে পরিচালন ব্যয় বাদ দিয়ে ৪৩৯.৭৮ কোটি টাকা নিট মুনাফা অর্জন করেছে। আগের বছরেও অর্থাৎ করোনা মহামারির মধ্যে যখন বিশ্বের বৃহৎ এয়ারলাইন্সসহ সিংহভাগ এয়ারলাইন্স লোকসানের মধ্যে ছিল, সে বছরও চার্টার্ড ফ্লাইট পরিচালনা করে ১৫৮ কোটি টাকা নিট মুনাফা অর্জন করেছিল বিমান।

বিএনপি আমলে কেমন ছিল বিমান?
২০০১ সালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার ক্ষমতায় এসে জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমানকে পরিণত করে দুর্নীতি আর লুটপাটের স্বর্গরাজ্যে। খালেদা জিয়ার ভাই শামীম ইস্কান্দাররা একচেটিয়া নিয়ন্ত্রণ করে বিমানের সাপ্লাই আর এয়ার ক্রাফট ক্রয়। বিএনপি আমলে সীমাহীন দুর্নীতির কারণে- নিউইয়র্ক, ব্রাসেলস, প্যারিস, ফ্রাংকফুর্ট, মুম্বাই, নারিতা এবং ইয়াঙ্গুন রুটে বিমান চলাচল বন্ধ করে দেয়। চরম লোকসান আর অব্যবস্থাপনায় বিমান মুখ থুবড়ে পড়ে। বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ছিলেন বিমান প্রতিমন্ত্রী। তিনি সৈয়দপুর বিমানবন্দর প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিলেন। রাজশাহী এয়ারপোর্টও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল বিএনপি। আর বরিশাল এয়ারপোর্ট বিমান চলাচল কমে যায়। রাডার স্টেশন ছিল নষ্ট। গোটা বিএনপি আমলে একাধিক আবেদনের পরেও এটা ঠিক করেনি মন্ত্রণালয়।

বিমানের ৫ টি ডিসি-১০ প্লেনের মধ্যে ৪ টিই অচল করে রাখা হয়েছিল। বিএনপি-জামায়াত জোট আমলে ডিসি-১০ প্লেনের ১০টি ইঞ্জিন বিদেশে মেরামতের নামে পড়ে থাকে। ফলে ৫ টির মধ্যে ৪ টি ডিসি-১০প্লেন আর উড্ডয়ন বন্ধ হয়ে যায়। এর চাপ পড়ল বিমানের তখনকার ৩ টি এয়ারবাস

এ্যারোপ্লেনের ওপরও। তাই বিমানের সমস্ত সিডিউল ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ে। প্রতিটি ফ্লাইট ডিলে তখন একটি নিত্য-নৈমত্তিক ব্যাপার ছিল। ডিসি-১০ প্লেনের ১০টি ইঞ্জিন ইচ্ছাকৃতভাবে বিদেশে ফেলে রাখা হয়।

নিউইয়র্কে নর্থ আটলান্টিক ট্রাভেল এজেন্সি নাম দিয়ে বিএনপি নেতাদের কয়েকটি ট্রাভেল এজেন্সি মিলে একটি সিন্ডিকেট করে। মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিমানের নিউইয়র্ক অফিসকে মৌখিকভাবে নির্দেশ দিলেন বিএনপি নেতা-কর্মীদের ট্রাভেল এজেন্সি ছাড়া অন্যরা বিমানের টিকেট বিক্রি করতে পারবে না। ওই ট্রাভেল এজেন্সিগুলো নিউইয়র্ক-ঢাকা-নিউইয়র্কের জন্য নির্ধারিত ভাড়ার চেয়ে অনেক বেশি দামে যাত্রীদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করত। ফলে ঢাকা-নিউইয়র্কের মধ্যে বিমানের যাত্রী কমতে শুরু করে। এক পর্যায়ে বিমানের ঢাকা- নিউইয়ের্কের ফ্লাইটই বন্ধ করে দেওয়া হয়।

আওয়ামী লীগের হাতে নিরাপদ ‘আকাশে শান্তির নীড়’
বিএনপি-জামায়াত জোট সরকারের অব্যবস্থপনা থেকে ঘুরে দাড়িয়েছে বাংলাদেশ বিমান। দেখেছে লাভের মুখ। বর্তমানে আন্তর্জাতিক মানের থার্ড টার্মিনাল তৈরির কাজ প্রায় শেষ। নতুন এই টার্মিনালে বিশ্বের ৫৪টি এয়ারলাইন্স তাদের অপারেশন পরিচালনা করবে। সেই সাথে বাড়বে বাংলাদেশ বিমানের ব্যাপ্তি আর ফ্লাইট সংখ্যা।

নতুন ১০টি এয়ারবাস
বাংলাদেশ বিমানের ফ্লাইট সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাংলাদেশ বিমানের বহরে যোগ হয়েছে নতুন অনেক বিমান। বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের নতুন উড়োজাহাজ ড্রিমলাইনারসহ বহরে উড়োজাহাজের সংখ্যা এখন ২১টি। তার মধ্যে ১৪টি নিজস্ব এবং ৫টি লিজ। নিজস্ব ১৪টির মধ্যে বোয়িং৭৭৭-৩০০ ইআর ৪টি, বোয়িং ৭৮৭-৮ ৪টি, বোয়িং ৭৮৭-৯ ২টি, বোয়িং ৭৩৭ ২টি এবং ড্যাশ-৮ ২টি।

ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের কথা চিন্তা করে বাংলদেশ বিমান তাদের বহরে বিমান সংখ্যা বাড়িয়েছে। সেই উদ্দেশ্যে সম্প্রতি ফরাসি প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রনের সাথে ১০টি অত্যাধুনিক এয়ারবাস কেনার চুক্তি হয়। এর আগে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের বোয়িং কোম্পানি থেকে কিস্তিতে ১২টি বিমান ক্রয় করেছিল।

যাত্রীসেবার মানোন্নয়নে এয়ারবাসের কাছ থেকে ১০টি উড়োজাহাজ কেনার প্রক্রিয়া বেশ আগেই শুরু করেছিল বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স। এতদিন এ নিয়ে সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে আলোচনা হয়েছে।

ফ্রান্সের এই নির্মাতা প্রতিষ্ঠানটির কাছ থেকে এ৩৫০ মডেলের উড়োজাহাজ জি-টু-জি পদ্ধতিতে কেনা হবে। এর আগে ৬ মে লন্ডনে বাংলাদেশ ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে এ সংক্রান্ত যৌথ ঘোষণা স্বাক্ষর হয়। পরে জানানো হয়, ২০৩০ সালের মধ্যে এয়ারবাস থেকে আটটি যাত্রীবাহী উড়োজাহাজ কিনবে বিমান। পরবর্তী সময়ে আলোচনা সাপেক্ষে আরও দুটি মালবাহী (কার্গো) উড়োজাহাজ কেনা হবে।

এয়ারলাইন্সে বিমান সংখ্যা কত হওয়া উচিত?
বিশ্বে লাভবান এয়ারলাইন্স পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যেই এয়ারলাইন্সের বিমান সংখ্যা যতো বেশি সেই এয়ারলাইন্স ততো বেশি লাভবান। ভারতে প্রাইভেট এয়ারলাইন্সগুলোতেও সর্বনিম্ন ২০০ এয়ারক্রাফট থাকে, যার বেশিভাগই ভারতের মধ্যে যাত্রীসেবা দেয়। সেই হিসাবে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উঠতে যাওয়া বাংলাদেশের রাষ্ট্রয়াত্ত্ব বিমানবহরে বিমানের সংখ্যা মাত্র ২১টি। বিশ্বের প্রায় ৪২টি দেশের সঙ্গে বিমানের আকাশসেবার চুক্তি থাকলেও মাত্র ১৬টি দেশে এখন কার্যক্রম বিদ্যমান। বিমানবহরে নতুন এয়ারক্রাফটগুলো যুক্ত হলে বন্ধ রুটসহ নতুন নতুন রুট চালু হবে।

নতুন উড়োজাহাজ সরবরাহে কমপক্ষে দুই বছর লাগবে। উড়োজাহাজ এলে বিমানের নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ হবে। জাপানে নতুন রুট চালু হয়েছে। কানাডায় আরও ফ্লাইট বাড়ানোসহ গুয়াংজু, যুক্তরাষ্ট্রসহ বেশ কয়েকটি নতুন রুট চালুর সিদ্ধান্ত এরই মধ্যে নেওয়া হয়েছে। এয়ারবাসের উড়োজাহাজ কেনা সেই পরিকল্পনারই অংশ। আগামী মাসের মধ্যে গুয়াংজু ফ্লাইট চালু হওয়ারও কথা রয়েছে। প্রায় একযুগ যুক্তরাষ্ট্রে বন্ধ থাকা ফ্লাইট চালু করতে কোনো বাধা নেই। সিভিল এভিয়েশনের গ্রিন সিগন্যাল পেলে বিমান যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লাইট চালু হবে। ধীরে ধীরে বাড়ছে সুশৃঙ্খল পরিকল্পিত ফ্লাইট সংখ্যা, যে কারণে যুগ যুগ ধরে লোকসানের খাতায় নাম লেখানো বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লাভের মুখ দেখছে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

বঙ্গবন্ধুর দর্শন এগিয়ে নিচ্ছেন শেখ হাসিনা

আজ ইলিশ উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে প্রথম, মিঠা পানির মাছ উৎপাদনে দ্বিতীয়, পাট উৎপাদনেও দ্বিতীয়। এছাড়া ধান ও সবজি উৎপাদনে বাংলাদেশ বিশ্বে তৃতীয় এবং আলু আম উৎপাদনে সপ্তম। ধান, গম ও ভুট্টা বিশ্বের গড় উৎপাদনকে পেছনে ফেলে এগোচ্ছে বাংলাদেশ। এরই মধ্যে বন্যা, খরা, লবণাক্ততা ও দুর্যোগ সহিষ্ণু শষ্যের জাত উদ্ভাবনেও শীর্ষে বাংলাদেশের নাম। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কৃষি-দর্শনের আলোয় হাঁটছেন শেখ হাসিনা ।

গল্পটা শুরু বঙ্গবন্ধুর হাতে
মুক্তিযুদ্ধের পর স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম মন্ত্রিপরিষদের প্রথম বৈঠকেই সবুজ বিপ্লবের আহবান জানান বঙ্গবন্ধু। দিনটা ছিল ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি। কৃষি উৎপাদন বাড়াতে অনেকটা সামাজিক আন্দোলনের মত করে এই আহবান জানান তিনি। কৃষকদের সব বকেয়া খাজনার সুদ মাফ করে ভবিষ্যতে যে কোনো কৃষকের ২৫ বিঘা পর্যন্ত জমির খাজনা মওকুফের ঘোষণা দেন।

রাষ্ট্রপতির ১৩৫ নম্বর আদেশের মাধ্যমে নদী কিংবা সাগরের মধ্যে জেগে ওঠা চরে, জমির মালিকানা রাষ্ট্রের হাতে নিয়ে দরিদ্র কৃষকদের দিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। একই সাথে খাস জমি প্রান্তিক অস্বচ্ছল কৃষকদের মধ্যে বণ্টনের উদ্যোগ নেন। পাকিস্তান সরকারের সময় দায়ের করা ১০ লাখ সার্টিফিকেট মামলা থেকে কৃষকদের মুক্তি দেন। কৃষকের স্বার্থ রক্ষায় ১৯৭৩ সালে রাষ্ট্রপতির ২৭ নম্বর অধ্যাদেশ বলে বঙ্গবন্ধু প্রতিষ্ঠা করেন ‘বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক’।

আবার শুরু করতে হলো
বঙ্গবন্ধু হত্যার পর ১৪ বছরের সামরিক শাসন এবং পাঁচ বছরের বিএনপি শাসনামলে কৃষি ব্যবস্থাপনা ছিল খুবই দুর্বল এবং বুলি সর্বস্ব প্রচার। এই খাত ভরে গিয়েছিল অপরিকল্পিত খাল খননের মত কিছু লোক দেখানো ছেলে খেলায়। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় আসতে বাংলাদেশকে অপেক্ষা করতে হলো ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত। প্রথমবার সরকার গঠন করলেন শেখ হাসিনা। দেখলেন, দেশে খাদ্য ঘাটতি ৪০ লাখ মেট্রিক টন। তিনি কাজ শুরু করলেন। প্রথমে কৃষিতে বাজেট বাড়ালেন। ১৯৯৬-৯৭ অর্থবছরের বাজেটে শুধু কৃষি গবেষণার বরাদ্দ ছিল ১২ কোটি টাকা।

সরকার ক্ষমতায় আসার বছরেই কৃষিখাতে বাজেটের এই বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে ছিল ঐতিহাসিক। ১৯৯৭-৯৮ অর্থবছরে, অর্থাৎ সরকার গঠনের পরের বছরই কৃষিখাতের বাজেট উন্নীত হয় ১০০ কোটি টাকায়, যা সম্পূর্ণ ব্যয় করা হয় কৃষি ও কৃষি সংক্রান্ত আইসিটি খাতে।

আরেকটি কালো অধ্যায়
বিএনপি জামাত জোট সরকারের সময়ে ২০০১ থেকে ২০০৬ পর্যন্ত পুনরায় দেশের কৃষিতে ধস নেমে আসে। আওয়ামী লীগ সরকার শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যেখানে খাদ্য উদ্বৃত্ত রেখে যায়, সেখানে খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় । যে কারণে আমদানি নির্ভরতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রয়োজনীয় সরকারি কর্মসূচি ও সীমাহীন দুর্নীতির জন্য কৃষকরা বিপদে পড়েন।

বিদ্যুৎক্ষেত্রে বিএনপি-জামাতের সীমাহীন দুর্নীতির জন্য বিদ্যুৎ উৎপাদন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পায়। এতে সেচ প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। সরকারি ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা থেকে লাখ লাখ বস্তা সার লুট করে তা দ্বিগুণ দামে খোলা বাজারে বিক্রি করতো বিএনপি-জামাতের কর্মীরা। যেকারণে সারের তীব্র সংকট তৈরি হয়। সারাদেশে বিদ্যুৎ ও সারের অভাবে আন্দোলনে নামতে বাধ্য হন কৃষকরা। আন্দোলনরত কৃষক-শ্রমিকের ওপর পুলিশি নির্যাতন নেমে আসে। কোনো কোনো জায়গায় পুলিশের গুলিতে নিহত হন কৃষক।

২০০৪ সালের ২৩ মার্চ যশোরসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবিরাম লোডশেডিংয়ের কারণে কৃষক এবং পোল্ট্রি খামারিদের মধ্যে নাভিশ্বাস ওঠে। পোল্ট্রি ব্যবসা প্রায় লাটে ওঠে। গরমে খামারের বাচ্চা-বাচ্চা মুরগিগুলো মারা যেতে থাকে। লোডশেডিং ও লো- ভোল্টেজে তৃণমূলের শতশত সেচপাম্প বিকল হয়ে যায়।
২০০৬ সালের ৫ মার্চ খুলনার রূপসায় বিদ্যুতের দাবিতে আন্দোলনে নামে জনতা। এসময় জোট সন্ত্রাসীদের হামলায় কমপক্ষে ২০ জন আহত হন। ওই বছরই বিদ্যুৎ ও সার সংকটের প্রতিবাদে যশোর-মাগুরা ও যশোর-খুলনা সড়কে গাছের গুঁড়ি ফেলে অবরোধ সৃষ্টি করেন চাষিরা। নওগাঁয় বিদ্যুতের জন্য ৫ হাজারেরও বেশি কৃষক ঘেরাও করেন বিদ্যুৎ অফিস।

একই বছরে বিদ্যুতের দাবিতে চাঁপাইনবাবগঞ্জের শিবগঞ্জের কানসাটে আন্দোলনরত জনতার ওপর সরকারের পেটোয়া বাহিনীর অকস্মাৎ গুলিতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন সাতজন সাধারণ মানুষ। পাঁচ মাসের ওই আন্দোলনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে প্রাণ হারান ১৭ জন। আহত হন অন্তত ৬০০ মানুষ। এ ঘটনায় সারাদেশ ফুঁসে ওঠে।

২০০৮ থেকে কৃষিখাতের পুনর্জাগরণ
২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বরের নির্বাচনে জনগণের বিপুল সমর্থন নিয়ে পুনরায় আওয়ামী লীগ সরকার যখন দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নেয় তখন দেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল ২৬ লাখ টন। প্রথম ক্যাবিনেট সভাতেই সারের দাম কমানোর সিদ্ধান্ত নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি ৯০ টাকার ট্রিপল সুপার ফসফেটের দাম কেজি প্রতি ২২ টাকা ও ৭০ টাকার মিউরেট অব পটাসের দাম কেজি প্রতি ১৫ টাকায় নামিয়ে আনেন। ফলে সুষম সার ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি নিশ্চিত হয়। কৃষি যান্ত্রিকীকরণে ভর্তুকি দেয়া, সেচ সুবিধা বাড়ানো, সার বিতরণ ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনাসহ নানামুখী পদক্ষেপ নেয় শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার।

এর পরপরই কৃষি গবেষণায় অগ্রাধিকার দেয় সরকার। যার ফলে প্রতিটি কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটে ল্যাব উন্নয়নসহ নানামুখী গবেষণা পরিচালনা করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। দেশে প্রথমবারের মতো ডিজিটাল কৃষি তথা ‘ই-কৃষি’র প্রবর্তন করা হয়। এখন দেশে মোট ৪৯৯টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি), কৃষি কল সেন্টার-১৬১২৩, কৃষি কমিউনিটি রেডিও, কৃষি তথ্য বাতায়ন তৈরি করা হয়েছে। ফলে দেশের প্রান্তিক কৃষকসমাজ সহজেই কৃষিখাতের আধুনিকায়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে পারছেন।

শেখ হাসিনার সরকার কৃষককে মাত্র ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খোলার সুযোগ করে দেওয়ায় ১ কোটি ১ লাখ ১৯ হাজার ৫৪৮টি ব্যাংক হিসাব খোলা সম্ভব হয়েছে, যেখানে বর্তমান স্থিতি প্রায় ২৮২ কোটি টাকা। সরকার ২০০৮-০৯ অর্থবছর থেকে প্রণোদনা চালু করেছে। অদ্যাবধি এ কর্মসূচির মাধ্যমে ৮২৭ কোটি ১৭ লাখ টাকা দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে ৭৪ লাখ ৫৪ হাজার ৩১৩ কৃষক উপকৃত হয়েছেন।

আলোর পথে বাংলাদেশ
২০১৯-২০ অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ ছিল ৮০০০ কোটি টাকা। করোনা সংকটের মুখে খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে ২০২০-২১ অর্থবছরে কৃষি ভর্তুকির পরিমাণ বাড়িয়ে ৯৫০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। বিএনপি আমলে যেখানে মোট ফসল উৎপাদন ছিল মাত্র ২ কোটি ৬১ লাখ টন। সেখানে আওয়ামী লীগ সরকারের সময় আমলে ২০২২ সালে মোট ফসল উৎপাদন হয় ৯ কোটি ১৯ লাখ ১৮ হাজার ৮০০ টন। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে এখন সবার আগে দেশের নেতৃত্ব দিচ্ছে কৃষি। কৃষকদের জীবনযাত্রার মানেও এসেছে আমূল পরিবর্তন। লেখাপড়া শেষ করে বহু ছেলে মেয়ে কৃষিকে পেশা হিসেবে বেছে নিচ্ছে।

কৃষিখাত হয়ে উঠছে দেশে কর্মসংস্থানের অন্যতম আশ্রয়।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

নাইকো দুর্নীতিতে খালেদা জিয়া ও ‘হাওয়া ভবন’ সম্পৃক্ততার সাক্ষ্য আসছে

বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার নাইকো দুর্নীতি মামলা কার্যক্রম আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর নতুন পথে হাঁটার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নাইকো দুর্নীতি মামলায় যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (এফবিআই) এক কর্মকর্তা ও কানাডার রয়্যাল মাউন্টেড পুলিশের ২ কর্মকর্তাকে সাক্ষী হিসেবে আদালতে হাজির করার অনুমতি চেয়ে আবেদন করেছে প্রসিকিউশন। অ্যাটর্নি জেনারেল এ এম আমিন উদ্দিন ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-৯-এর আদালতে এ আবেদন করেন।

সামনে বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন। সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপি প্রধান খালেদা জিয়া এরই মধ্যে একাধিক দুর্নীতির মামলায় সাজা পেয়ে কারাবন্দি। একই সময়ে বাংলাদেশের আদালতে চলছে ‘নাইকো’ দুর্নীতি মামলার শুনানি। এবার সেটা একধাপ এগিয়ে নেওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

খালেদা জিয়া ছাড়া এই মামলার অন্য আসামিরা হলেন- সাবেক মন্ত্রী প্রয়াত ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ, সাবেক জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী প্রয়াত এ কে এম মোশাররফ হোসেন, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব কামাল উদ্দিন সিদ্দিকী, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাবেক ভারপ্রাপ্ত সচিব খন্দকার শহীদুল ইসলাম, সাবেক সিনিয়র সহকারী সচিব সি এম ইউছুফ হোসাইন, বাপেক্সের সাবেক মহাব্যবস্থাপক মীর ময়নুল হক, বাপেক্সের সাবেক সচিব মো. শফিউর রহমান, ব্যবসায়ী গিয়াস উদ্দিন আল মামুন, বাগেরহাটের সাবেক এমপি ও ঢাকা ক্লাবের সাবেক সভাপতি এম এ এইচ সেলিম এবং নাইকোর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক ভাইস প্রেসিডেন্ট কাশেম শরীফ। এরইমধ্যে ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ,

এ কে এম মোশাররফ হোসেনের মৃত্যু হওয়ায় আসামির তালিকা থেকে তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

যেভাবে দুর্নীতি হয়েছিলো

কানাডায় নিবন্ধিত তেল ও গ্যাস উৎপাদন কোম্পানি ‘নাইকো’বাংলাদেশের কয়েকটি গ্যাস ফিল্ড লিজ নেওয়ার চেষ্টা করেছিলো। পূর্ব ও পশ্চিম ছাতক গ্যাসফিল্ড নিয়েই মূলত বিতর্ক। ২০০২ সাল পর্যন্ত পূর্ব ছাতক গ্যাস ফিল্ড একটি ভার্জিন গ্যাস ফিল্ড অর্থাৎ গ্যাসে পূর্ণ ছিল বলে বাপেক্স এবং বাংলাদেশের দেশীয় প্রতিষ্ঠানগুলো অভিমত দিয়েছিল। ‘নাইকো’ নানা অসৎ পন্থা অবলম্বন করে আমাদের দেশের তৎকালীন ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের প্রভাবিত করে এই পূর্ব ছাতক গ্যাস ফিল্ডটি লিজ নেয় এবং একটি পরিত্যক্ত গ্যাস ফিল্ড হিসেবে এটাকে তখন তাদের হাতে দেওয়া হয়। আসলে এই গ্যাস ফিল্ড কখনো পরিত্যক্ত ছিল না৷ কিন্তু তখন অস্বচ্ছ এক চুক্তিতে নাইকোকে দু’টি গ্যাসফিল্ডই পরিত্যক্ত হিসেবে কম দামে দিয়ে দেওয়া হয়। এর সঙ্গে তারেক রহমানের হাওয়া ভবন সরাসরি যুক্ত ছিলো।

সেই ‘নাইকো’ দুর্নীতির ঘটনা এখন বিশ্বখ্যাত। কানাডার আদালতে এরইমধ্যে ‘নাইকো’ দুর্নীতি মামলায় কানাডিয়ান অপরাধীদের দণ্ডিত করা হয়েছে। এদিকে বাংলাদেশের আদালতে দায়েরকৃত ‘নাইকো’ দুর্নীতি মামলায় বাংলাদেশি অপরাধীদের বিরুদ্ধে বিচারিক প্রক্রিয়া চলমান।

২০১৮ সালের ২২ নভেম্বর ‘নাইকো’ দুর্নীতি মামলায় রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশনের (এফবিআই) তদন্ত প্রতিবেদন দাখিল করে রয়্যাল কানাডিয়ান মাউন্টেড পুলিশ এবং যুক্তরাষ্ট্রের এফবিআইয়ের কয়েকজন কর্মকর্তার সাক্ষ্য নিতে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিচারিক আদালতে আবেদন করা হয়। এবছর ৯ সেপ্টেম্বর আবারও সেই আবেদন সামনে আনা হয়েছে। যদি আবেদনটি বাংলাদেশের আদালত আমলে নেয়, তাহলে এটিই হবে বাংলাদেশের কোনো আদালতে প্রথমবারের মত আন্তর্জাতিক দুর্নীতির মামলায় বিদেশি নাগরিকের সাক্ষী হিসেবে সাক্ষ্যগ্রহণের ঘটনা। এবং মামলার কার্যক্রমের জন্য বাংলাদেশ আরেকধাপ এগিয়ে যাবে।

কানাডার তদন্ত শুরু ২০০৫ সালেই

পূর্ব ছাতকের গ্যাস ফিল্ড নেওয়ার ব্যাপারে ‘নাইকো’ যে ঘুষ প্রদান করে, তা নিয়ে কানাডার রয়্যাল মাউন্টেড পুলিশ ২০০৫ সালে তদন্ত শুরু করে এবং তারা তদন্তে প্রমাণ পায়, ‘নাইকো’ কোম্পানি

কানাডা থেকে ঘুষের টাকা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন দেশ হয়ে বাংলাদেশে পাঠিয়েছিল এবং কয়েকজন ব্যক্তিকে ঘুষ দিয়েছিল। পরবর্তীতে ২০০৭ সালের ৯ ডিসেম্বর বাংলাদেশের দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক) রাজধানীর তেজগাঁও থানায় একটি মামলা করে। এরপর ২০০৮ সালের ৫ মে চুক্তির সময়কার প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়াসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র (চার্জশিট) জমা দেয় দুদক। অভিযোগপত্রে আসামিদের বিরুদ্ধে প্রায় ১৩ হাজার ৭৭৭ কোটি টাকার রাষ্ট্রীয় ক্ষতির অভিযোগ আনা হয়।

শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে মামলা খারিজ যে কারণে

এই মামলা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া উভয়ের বিরুদ্ধেই ছিল, কিন্তু শেখ হাসিনার বিপক্ষে মামলা খারিজ হয়ে গেছে এবং খালেদা জিয়ার বিপক্ষে মামলা চলছে। অনেক সময় নিন্দুকেরা বলার চেষ্টা করেন যে, কেন শেখ হাসিনার মামলাটি খারিজ হলো। কারণটা স্পষ্ট। কখনো খোঁজ নিয়ে দেখলে প্রশ্নটা উত্থাপন করতো না কেউ। শেখ হাসিনার সরকার ১৯৯৬-২০০১ সালে ‘নাইকো’ কোম্পানির সঙ্গে দরকষাকষি করেছে, শেষ পর্যন্ত তারা চুক্তি করেনি। কারণ ‘নাইকো’র একটি শর্ত বাংলাদেশের স্বার্থের বিপক্ষে যাচ্ছিল।

অন্যদিকে খালেদা জিয়ার সরকার ২০০১ সালে ক্ষমতায় এসেই নাইকোর সঙ্গে তাদের সব শর্ত মেনে চুক্তি সই করে ফেলে। ২০০৩ সালের ১৬ অক্টোবর নাইকো-বাপেক্স জেভিএ সই হয়। পরবর্তী সময়ে কানাডার আদালতে প্রমাণিত হয় যে নাইকো বাংলাদেশে খালেদা জিয়ার আমলে ঘুষ দিয়ে কাজ পায়। হাওয়া ভবনের গিয়াস উদ্দিন আল মামুন ঘুষ নেন এবং খালেদা জিয়ার তৎকালীন জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী এ কে এম মোশাররফ হোসেনকে ১ লাখ ৯০ হাজার কানাডীয় ডলার দামের একটি গাড়ি ও বিদেশ সফরের জন্য পাঁচ হাজার ডলার ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ ওঠে নাইকোর বিরুদ্ধে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

শেখ হাসিনা ও দেশের উন্নয়ন সমার্থক

একটা দেশের জনবহুল শহরের মানুষের যাতায়াতের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা রাখে গণপরিবহণ। বিশ্বের বড় বড় শহরগুলোতে গণপরিবহণ হচ্ছে যাতায়াতের প্রধান মাধ্যম। বিশেষ করে পিক আওয়ার বা ব্যস্ত সময়ে হাজার হাজার মানুষ ব্যক্তিগত গাড়ির বদলে গণপরিবহণে যাতায়াত করে নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে ছুটে যান। বাড়িও ফিরেন একই ব্যবস্থায়। এতে করে ওই শহরের উপর যেমন ছোট ছোট যানবাহনের চাপ কম পড়ে তেমনি মানুষও স্বাচ্ছন্দ্যে যাতায়াত করতে পারেন এবং নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছতে পারেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য হচ্ছে ঢাকা মহানগরীর মত জনবহুল শহরে সেই রকম গনপরিবহণ গড়ে উঠেনি স্বাধীনতার প্রায় ৪০ বছরেও। শাসক এসেছে, শাসক গিয়েছে, কিন্তু কেউ এ নিয়ে ভাবেনি। বরং স্বাধীনতার পর মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় বাংলাদেশ রাষ্ট্র যেন পিছনের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

মুক্তিযুদ্ধের পর ভঙ্গুর বাংলাদেশ যখন সবেমাত্র গড়ে তোলার কাজে হাত দিয়েছেন বঙ্গবন্ধু ঠিক তখনই বাংলাদেশের আকাশে যেন কালো মেঘ ভর করে। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বপরিবারে হত্যা করে বাংলাদেশকে পিছনের দিকে টেনে নেওয়ার চেষ্টা করে খন্দকার মোশতাক থেকে শুরু করে সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান, স্বৈরাশাসক হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ, খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি এবং পরবর্তিতে বিএনপি-জামায়াত জোট সরকার। পরবর্তীতে একই ধারবাহিকতা যেন বজায় রাখে ফখরুদ্দীন-মঈন উদ্দীনের সরকার। তারা জনগণের বাহবা নিতে দেশব্যাপী শুরু করে উচ্ছেদ অভিযান। যাতে হাজার হাজার মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। কিন্তু এসব সরকারের কেউই বাংলাদেশকে সত্যিকারের সোনার বাংলা হিসেবে গড়ে তুলতে কোনো উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি। না হলে তো রাজধানীর ঢাকার মত জনবহুল শহরকে নিয়ে, শহরের যোগাযোগ অবকাঠামো নিয়ে ভাবতো, পরিকল্পনা গ্রহণ করতো। আমরা স্বাধীনতার প্রায় ৪০ বছরে সেরকম কোনো উদ্যোগ দেখিনি।

২০০৯ সালে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে যখন মহাজোট নিরঙ্কুশ বিজয় নিয়ে সরকার গঠন করলো, দেশ পরিচালনার দায়িত্ব নিলো তখন থেকেই দেশের অবকাঠামোগত উন্নয়ন, আর্থসামাজিক উন্নয়ন, অর্থনৈতিক মুক্তি,

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নসহ সামগ্রিক উন্নয়নে কাজ শুরু করেন আজকের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সময়েই যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে গ্রহণ করা হয় স্বল্প, দীর্ঘ ও মধ্য মেয়াদী নানান পরিকল্পনা। বিশেষ করে রাজধানীর ঢাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে মহাপরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

রাজধানীবাসীর যাতায়াত সহজ করার মধ্য দিয়ে নিত্য দিনের ভোগান্তি দূর করার জন্য নেওয়া হয় নানান পরিকল্পনা। এরমধ্যে অন্যতম একটি মহাপরিকল্পনা হচ্ছে জনবহুল সিটি ঢাকাকে মেট্রোরেলের আওতায় নিয়ে আসা।

আমাদের পাশের দেশ ভারতের পশ্চিমবঙ্গের রাজধানী কলকাতায় প্রথম মেট্রোরেল চালু হয় ১৯৮৪ সালে। আমাদের স্বাধীনতার মাত্র ১৪/১৫ বছরের মাথায়ই কলকাতার যাতায়াতে এমন চমৎকার উদ্যোগ বাস্তবায়ন করা হয়। অথচ আমাদের তৎকালীন সরকার প্রধানরা একবারের জন্যও ভাবেননি রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন নিয়ে। তারা ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের আখের গোছাতে। অথচ ওই সময়ে যদি আমাদের সরকার প্রধানরা তাদের ভাবনার মধ্যে নিতেন এই যোগযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের বিষযটি তাহলে হয়তো আজকে এই একুশ শতকে এসে আমাদেরকে এতো ভোগান্তি পোহাতে হতো না।

২০০৯ সালে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে মহাজোট সরকার ক্ষমতায় এসেই প্রথম পরিকল্পনা গ্রহণ করে রাজধানীর যোগযোগ ব্যবস্থা নিয়ে। কিভাবে যোগাযোগ ব্যবস্থাকে সহজ করে কর্মজীবী সাধারণ মানুষের তথা নগরবাসীর যাতায়াত ব্যবস্থাকে নাগালের মধ্যে নিয়ে আসা যায় সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করে। এরই অংশ হিসেবে পরিকল্পনা নেওয়া হয় রাজধানী ঢাকায় মেট্রোরেল ব্যবস্থা চালু করার। এতে দ্রুততম সময়ে এক স্থান থেকে আরেক স্থানে যাতায়াত করা যাবে। কম সময়ে নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছা যাবে। যেমন চিন্তা তেমন কাজ। যেহেতু সাবওয়ে নির্মাণ ব্যয়বহুল ও সময়সাপেক্ষ তাই প্রথম ধাপে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় মেট্রোরেল (উড়াল) নির্মাণের।

মেট্রোরেল নির্মাণের অংশ হিসেবে ২০১৩ সালে জনবহুল ঢাকা মহানগরীর ক্রমবর্ধমান যানবাহন সমস্যা ও পথের দুঃসহ যানজট কমিয়ে আনার লক্ষ্যে কৌশলগত পরিবহন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনার অধীনেই প্রথমবারের মত ঢাকায় মেট্রো রেল স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়। তার আগে ২০১২ সালের ১৮ ডিসেম্বর শেখ হাসিনা সরকারের অগ্রাধিকার প্রকল্পের অন্যতম মেট্রোরেল জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের

নির্বাহী কমিটিতে (একনেক) অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রথমে ঢাকায় তিনটি মেট্রোরেল লাইন স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হলেও ২০১৬ সালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সেই পরিকল্পনাকে সম্প্রসারিত করে তিনটির বদলে পাঁচটি লাইন নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। মূলত রাজধানীকে পুরোপুরি একটি পরিকল্পিত ও সুশৃঙ্খল যোগাযোগ ব্যবস্থার আওতায় নিয়ে আসতেই এই উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

এরই অংশ হিসেবে প্রথম পর্যায়ে উত্তরা থেকে মতিঝিল পরবর্তিতে সেটি সম্প্রসারিত করে ঢাকার কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন পর্যন্ত মেট্রোরেল-৬ নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হয়। উত্তরা থেকে মতিঝিল হয়ে কমলাপুর পর্যন্ত ২১ দশমিক ২৬ কিলোমিটার এমআরটি লাইন-৬ নির্মাণে কাজ শুরু হয় ২০১৬ সালের ২৬ জুন। মেট্রোরেলের এই লাইনটি দিয়াবাড়ি থেকে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ গত বছরের ২৮ ডিসেম্বর খুলে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেছেন। আর আগারগাঁও থেকে মতিঝিল পর্যন্ত অংশটি আগামী মাসেই খুলে দেওয়া হবে সাধারণের চলাচলের জন্য। প্রধানমন্ত্রী সেটি উদ্বোধনের কথা রয়েছে।

শুধু মেট্রোরেল লাইন-৬ নয়, জনবহুল রাজধানী ঢাকার নাগরিকদের যাতায়াত সুবিধা নিশ্চিত করতে ঢাকায় নির্মাণ করা হচ্ছে মেট্রোরেলের আরও ৫টি লাইন। ইতিমধ্যে লাইন-১ এর নির্মাণকাজের উদ্বোধন করেছেন প্রধানমন্ত্রী। বাকীগুলোর মধ্যে লাইন-২, লাইন-৪, লাইন-৫ উত্তর এবং লাইন-৫ দক্ষিণের কাজও শুরু হবে শিগগির।

এই যে একটা জনবহুল শহরের যোগাযোগের চেহারা বদলে দিতে, মানুষের যাতায়াত ব্যবস্থাকে নাগালের মধ্যে নিয়ে আসতে এতো পদক্ষেপ কিন্ত শেক হাসিনার সরকারই নিয়েছে। অদম্য সাহস আর সদিচ্ছা না থাকলে এমন যুগান্তকারী পদক্ষে নেওয়া যায় না। কেউ নিতে পারে না। এটা তো আর বরার বিষয় না। এটা এখন প্রমাণিত। অতীতে তো কোনো সরকার প্রধানকে দেখা যায়নি এমন উদ্যোগের বিষয়ে ভাবতে বা চিন্তা করতে। কারণ দেশপ্রেম যদি জাগ্রত না থাকে তাহলে কেউই দেশ বা দেশের মানুষের জন্য বাবে না, চিন্তা করে না।
শেখ হাসিনা সব চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে শত বাধা উপক্ষো করে দেশটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তার কাছে দেশ এবং দেশের মানুষ সবার আগে।

আজকে যদি দীর্ঘমেয়াদে শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার রাষ্ট্র ক্ষমতায় না থাকতো তাহলে হয়তো যোগাযোগ অবকাঠামোর বিশেষ করে

রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে এমন পরিকল্পনা হতো না। কারণ পাঁচ বছর মেয়দী সরকার কখনই দীর্ঘ মেয়াদী কোনো পরিকল্পনা নিতে চায় না কিংবা নেয়ও না। এটা তো নিকট অতীতে আমরা দেখেছি।

শুধু যে মেট্রোরেল দিয়েই জনবহুল নগরীর যানজট সমস্যার সমাধান করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তা কিন্তু নয়, এই শহরকে যানজটমুক্ত করতে এবং নগরবাসীকে যাতায়াতের ক্ষেত্রে স্বস্তি দিতে শেখ হাসিনার সরকার রাজধানী ঢাকা ঘিরে আরও বহু পরিকল্পনা নিয়েছে। যার অনেকগুলো ইতিমধ্যে বাস্তবায়নও হয়েছে। এরমধ্যে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে হচ্ছে অন্যতম একটি। বিমানবন্দর সংলগ্ন কাউলা থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম রোডের কুতুবখালী পর্যন্ত প্রায় ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ এই এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের একাংশ অর্থাৎ কাউলা থেকে ফার্মগেট পর্যন্ত খুলে দেওয়া হয়েছে। গত ২ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটি উদ্বোধন করেন। এরপর দিনই যানবাহন চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয় এক্সপ্রেসেওয়েটি। যার সুফলও পাওয়া যাচ্ছে।
এতো কিছু সম্ভব হয়েছে শুধুমাত্র শেখ হাসিনার সরকারের উন্নয়ন নীতির কারণে।

এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে দরকার একটা স্থিতিশীল ও দীর্ঘমেয়াদের সরকার। না হলে উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। আমরা অতীতে দেখেছি , সরকার পরিবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই থমকে যায় আগের সরকারের উন্নয়ন প্রকল্পগুলো। তাই উন্নয়ন ধারবাহিকতা রাখতে গেলে প্রয়োজন সরকারের ধারাবাহিকতা।
লেখক- গণমাধ্যমকর্মী।

বাংলার ছায়াসঙ্গী শেখ রেহানা

“বাংলাদেশের বাঙালিরা আমার বাবাকে মারবে, এটা আমাদের ধারণারও বাইরে ছিল”। ‘হাসিনা: আ ডটার’স টেল’ ছবিতে, ১০টি শব্দের আর্তনাদ ভরা একটি বাক্যটি বলেছিলেন বঙ্গবন্ধুকন্যা শেখ রেহানা। ১৫ আগস্ট রাতে বাবা-মা-ভাই-স্বজনদের হারানোর ভয়ার্ত কলঙ্কিত ইতিহাস উঠে এসেছে ওই বাক্যে। প্রতিটি শব্দ আর কষ্ঠস্বরে ছিল প্রিয়জন

হারানোর বেদনা। শেখ রেহানার এই ১০ শব্দের বাক্য, আমাদেরও প্রতি মুহূর্ত প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে রাখে। যে পিতা আমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন, তাঁকেই আমরা বাঁচাতে পারেনি- এই অপরাধবোধ বাঙালিদের বইয়ে বেড়াতে হবে অনন্তকাল।

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর যখন দেশের সবকিছু নিয়ন্ত্রণ ঘাতকের হাতে। তখন দেশের মানুষ তো বটেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ও বাংলাদেশের প্রকৃত খবর জানতো না। আর বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদ বা বিচার চাওয়া ছিল দুঃস্বপ্ন। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে জাতির পিতার হত্যার প্রথম বিচারের দাবি জানিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধুর ছোট মেয়ে শেখ রেহানা। ১৯৭৯ সালে সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বঙ্গবন্ধু ও জাতীয় চার নেতা খুনিদের বিচারের দাবি উত্থাপন করেন তিনি। এটি ছিল বিশ্বদরবারে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিচারের প্রথম আহ্বান।

আন্তর্জাতিক খ্যতিসম্পন্ন ব্রিটিশ আইনজীবীর স্যার টমাস উইলিয়ামসের সম্মতি নেয়ার জন্য ১৯৮০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝিতে ‘হাউস অব কমন্সে’ গিয়ে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন শেখ রেহানা ও তার স্বামী ড. শফিক আহমেদ সিদ্দিক। তিনি এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর পঞ্চম শাহাদাতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ১৬ আগস্ট ১৯৮০ পূর্ব লন্ডনের মাইল্যান্ড ইয়র্ক হলে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিদের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে শেখ হাসিনা প্রধান অতিথি এবং স্যার টমাস উইলিয়ামস কিউসি এমপি প্রধান বক্তা ছিলেন। বঙ্গবন্ধু ও চার জাতীয় নেতার হত্যা সম্পর্কে তদন্ত করার জন্য বিশ্বখ্যাত আইনজ্ঞদের নিয়ে ১৯৮০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর লন্ডনে একটি আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন গঠন করা হয়। ১৯৮২ সালের ২০ মার্চ আন্তর্জাতিক তদন্ত কমিশন বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারবর্গ এবং চার জাতীয় নেতার হত্যা সম্পর্কে প্রাথমিক রিপোর্ট পেশ করে।

বঙ্গবন্ধুর হত্যার বিচারের দাবিতে দৃঢ় ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা। দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালের আবার ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। শুরু হয় আইনি প্রক্রিয়া। ওই বছরের ১২ নভেম্বর জাতীয় সংসদে কুখ্যাত ‘ইনডেমনিটি’ অধ্যাদেশ বাতিল করা হয়। ১৯৯৭ সালের ১২ মার্চ বিচার শুরু হয়। ১৯৯৮ সালের ৮ নভেম্বর বিচারক কাজী গোলাম রসুল মামলার রায়ে ১৫ জনের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন।

১৯৭৯ সালে সুইডেনে বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারের যে দাবি তুলেছিলেন

শেখ রেহানা, তা বাস্তবায়ন হয় ৩১ বছর পর। যদিও সব আসামিকে এখনও ফাঁসিতে ঝোলানো যায়নি। পলাতক আসামিদের দেশে ফিরেয়ে এনে আদালতের রায় কাযকর হলে বাঙালি জাতি হিসেবে আমরাও কলঙ্কমুক্ত হবো।

জাতির পিতাকে হত্যার বিচারের দাবিতে আন্দোলন করে সফল হওয়া শেখ রাহানার ৬৯তম জন্মদিন আজ (১৩ সেপ্টেম্বর)। ১৯৫৫ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি। বঙ্গবন্ধু পরিবারের কনিষ্ঠ মেয়ে রেহানার নাম রাখা হয়, মায়ের ডাক নাম রেণুর প্রথম অক্ষর আর বড় বোন হাসিনার শেষের অক্ষর অক্ষুণ্ণ রেখে। পারিবারিক পদবি যুক্ত হয়ে পরিপূর্ণ নাম হয় শেখ রেহানা। অতি আদরের ছোট ভাই রাসেলের কাছে যিনি ছিলেন ‘দেনা’ আপা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকরা যখন বঙ্গবন্ধু ও তার পরিবারের সদস্যদের নির্মমভাবে হত্যা করে, তখন তিনি বড় বোন শেখ হাসিনার সঙ্গে জার্মানির কার্লসরুইয়ে অবস্থান করায় প্রাণে বেঁচে যান। কিন্তু তাদের অনেক চড়াই-উৎরাই পাড়ি দিতে হয়েছে। মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নেন আরেক বাঙালি পরিবারের সঙ্গে রুম ভাগাভাগি করে। আর্থিক অনটনের কারণে চাইলেই একক বাড়ি ভাড়া করে থাকার সামর্থ্য তাদের ছিল না। তাই শেখ রেহানাও বিভিন্ন জায়গায় চাকরির চেষ্টা করছিলেন। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনেও কর্মখালি দেখে চেষ্টা করেছেন কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়নি। লন্ডনে মেট্রো ও বাসে যাতায়াত করতে হয়েছে তাঁকে।

শেখ রেহানা নিজেই লিখেছেন- “লন্ডনে আসার পর চাকরির জন্য যখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরি, তখন কত পরিচিতজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, সবাই এড়িয়ে যেতে চায়। চাকরি নিলাম একটি লাইব্রেরি ও পাবলিশার্স কোম্পানিতে। এর পর তো অনেক পথ পাড়ি দিলাম। আমাদের বাসায় রাত-দিন আসা-যাওয়া করত এমন ব্যক্তিও রাস্তায় দেখা হলে চোখ ফিরিয়ে নিত। অবশ্য কেউ কেউ সাহায্যও করেছে।”

ঘাতকরা অস্ত্র দিয়ে ভয় দেখিয়েছিল ঠিকই কিন্তু বাংলার সাধারণ মানুষ কখনও বঙ্গবন্ধুকে ভুলে যায়নি। অনেক লড়াই সংগ্রামের পর ১৯৯৬ সালে আবারও ক্ষমতায় আসে আওয়ামী লীগ। গত ১৫ বছর ধরে আওয়ামী লীগ টানা ক্ষমতায় কিন্তু কখনই সরকার বা রাজনীতিতে দেখা যায়নি শেখ রেহানাকে। তবে মানুষের কল্যাণে বড় বোন শেখ হাসিনার পাশে সব সময়ই পাশে রয়েছেন শেখ রেহানা। এই বিষয়ে শেখ রেহানা নিজেই বলেছেন-“আমরা দুবোন একে অপরের পাশে আছি। দুজন দুজনকে সাহায্য করি। খুব ভালোবাসি।” আর বড় বোন শেখ হাসিনাও অকপটে বলে থাকেন- “রেহানা

ছাড়া তিনি পরিপূর্ণ নন। রেহানার মাঝে তিনি তার মায়ের ছায়া দেখতে পান। সুযোগ্য মায়ের যোগ্য উত্তরসূরি শেখ রেহানা।”

অতি সাধারণ মানুষের মতোই জীবনযাপন করেন শেখ রেহানা। আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের কাছে ‘ছোট আপা’ হিসেবে পরিচিত তিনি। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন-সংগ্রামে প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনাসহ দলের পাশে থেকে অনুপ্রেরণা, সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন শেখ রেহানা। ২০২২ সালের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অনুষ্ঠানে শেখ রেহানা শিশুদের উদ্দেশ্যে বলেন, ‘আমার বোন শেখ হাসিনা প্রবাস থেকে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন দেশে ফিরবেন সিংহের মতো। ঘাতকদের ভয় করলে চলবে না। তাই আমি তাকে সিংহ বলেই ডাকি।’ ১/১১ এর সময় শেখ হাসিনাকে গ্রেপ্তারের পর যখন আওয়ামী লীগকে ভাঙার চেষ্টা হয়, শেখ হাসিনাকে মাইনাস করার ষড়যন্ত্র হয়। তখন পর্দার আড়ালে থেকে দৃঢ় অবস্থান নিয়ে সেই সংকট থেকে জাতিকে উদ্ধারে বড় ভূমিকা রাখেন শেখ রেহানা।

শেখ রেহানা একজন ‘রত্নগর্ভা মা’। সন্তানদের তিনি গড়ে তুলেছেন মায়ের শিক্ষা ও বাবার আদর্শে। মেয়ে টিউলিপ সিদ্দিক ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একজন গুরুত্বপূর্ণ এমপি। ছেলে রেদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি একজন গবেষক এবং আওয়ামী লীগের গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ইনফরমেশনের (সিআরআই) ট্রাস্টি হিসেবে প্রতিষ্ঠানটি দেখভাল করেন। ছোট মেয়ে আজমিনা সিদ্দিক রুপন্তী মেধাবী শিক্ষার্থী হিসেবে পাশ্চাত্যে সাড়া ফেলেছেন।

নিরহংকারের অন্যতম উদাহরণ হলেন শেখ রেহানা। বড় বোন চারবারের প্রধানমন্ত্রী অথচ তার পথচলায় এর কোনো চিহ্ন নেই। সব সময় ভাবেন দেশের মানুষের কল্যাণ। বড় বোন শেখ হাসিনার সঙ্গে ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক বাড়িটি স্মৃতি জাদুঘর করে দেশের জনগণের জন্য উৎসর্গ করে দিয়েছেন শেখ রেহানা। একইভাবে ধানমন্ডিতে তার নামে বরাদ্দ বাড়িটিও দান করে দিয়েছেন দেশের কাজে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

বাংলাদেশের অর্জন এবং শেখ হাসিনা

আজ থেকে চার দশক আগেও বাংলাদেশকে একটা তলাবিহীন ঝুড়ি হিসেবে জানতো এবং চিনতো পুরো বিশ্ব। বিভিন্ন দেশ আর দাতা সংস্থার সাহায্য নিয়েই চলতো বাংলাদেশ। বিশ্ব দরবারে আমাদের পরিচিতি ছিলো হতদরিদ্র, গরিব রাষ্ট্র হিসেবে। খাদ্যে স্বয়ংসম্পুর্ণতা ছিলো না। আর্থিক অবস্থা ছিলো একেবারেই দিনহীন। ছিলো না উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা। দেশি কিংবা বিদেশী বিনিয়োগের পরিবেশ সে তো অনেক দূরের বিষয়। এ কারণে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মানুষের কাছে আমরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারতাম না।

সেই দরিদ্র, ভঙ্গুর অর্থনীতির রাষ্ট্র বাংলাদেশের চেহারা আমূল পাল্টে গেছে গত প্রায় এক দশকেরও বেশি সময়ে। বিশ্ব দরবারে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ। সারা বিশ্বে আজ বাংলাদেশের পরিচিতি একটি উন্নয়নশীল এবং উদীয়মান অর্থনীতির দেশ হিসেবে। বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমের চোখে বাংলাদেশ এখন আর আগের বাংলাদেশ নেই। এটি আগামী দেড় দশক পর অর্থাৎ ২০৪০ সালে বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী অর্থনীতির দেশে পরিণত হবে। সে লক্ষ্যে পাল্লা দিয়ে ছুটছে প্রতিদ্বন্দ্বি দেশগুলোর দিকে। এ কারণে বিশ্বের বড় বড় দেশগুলোর চোখ এখন ৫৫ হাজার বর্গ মাইলের ব-দ্বীপের দিকে। চীন, ভারত, জাপান, সৌদিআরব, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইউরোপীয় ইউনিয়নের বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীদের দৃষ্টি এখন বাংলাদেশের দিকে। এসব দেশের বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশকে তাদের বিনিয়োগের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। আর এ দিক থেকে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে চীন।

এই যে মাত্র এক দশক সময়ে বাংলাদেশের চেহারাটা পাল্টে গেলো, বিনিয়োগকারীরা বাংলাদেশকে তাদের বিনিয়োগের উত্তম স্থান হিসেবে বেছে নিচ্ছে এবং নিলো তার নেপথ্যের কারিগর কিন্তু একজন। আপনি মানেন বা না মানেন স্বীকার করেন বা না করেন- তাতে কিছু যায় আসে না। সত্যটা হচ্ছে- গত এক দশকের বেশি সময়ে বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে টেনে নিয়েছেন যিনি তিনি শেখ হাসিনা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের যোগ্য উত্তরসূরী টানা তিনবার সহ চার বারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তার হাত ধরেই আজ বিশ্ব দরবারে অনন্য উচ্চতায় বাংলাদেশ।

গত এক দশকের বেশি সময়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ অবিস্মরণীয় উন্নতি করেছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং মানবিক উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। বিশ্ব নেতাদের কাছে বাংলাদেশ এখন গুরুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশ এখন উদীয়মান অর্থনীতির দেশ।

যুক্তরাজ্যের প্রভাবশালী অর্থনীতি ও রাজনীতি বিষয়ক সামিয়িকী দি ইকোনমিষ্টের সহযোগি প্রতিষ্ঠান ‘ইকোনমিষ্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (ইআরইইউ) ‘ এর সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনেও বাংলাদেশের এগিয়ে যাওয়ার কথা তুলে ধরা হয়েছে। ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ২০৪০ এর মধ্যে বিশ্বের শীর্ষ ২০টি দেশের অর্থনীতির একটি হবে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের বাজারের আকার, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সম্ভাবনাময় কিছু খাতের ওপর ভিত্তি করে ইআরইইউ তাদের প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছে, চীনের বিনিয়োগকারীদের জন্য পছন্দের গন্তব্য হচ্ছে বাংলাদেশ।

চীনের বিনিয়োগকারীদের কাছে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয় তার একটা তালিকা তৈরি করে ইআরইইউ বলেছে, তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১২তম। অথচ ২০১৩ সালেও এই অবস্থান ছিল ৫২তম। অর্থাৎ বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আগের চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল।

ইআরইইউ’র প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, বাংলাদেশে এখন বিনিয়োগের সম্ভাবনাময় খাত হচ্ছে ইলেকট্রনিক ভোগ্যপণ্য, তথ্য-প্রযুক্তিসেবা, টেলিযোগাযোগ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং গাড়ি শিল্প। প্রতিবেদন অনুযায়ি বাজার সম্প্রসারণমূলক বিনিয়োগের ক্ষেত্রে সবচেয়ে আকর্ষণীয় গন্তব্যের দেশগুলোর তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান দ্বিতীয়। বাংলাদেশের আগে আছে ইন্দোনেশিয়া। আর পরের দিকে আছে ভিয়েতনাম, মালয়েশিয়া, পাকিস্তান, কম্বোডিয়া, মিশর, ভারত ও তানজানিয়া। আর সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নমূলক বিনিয়োগে এগিয়ে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম।

তিবেদনে বলা হয়েছে, যেসব দেশে ঝুঁকি কম এবং সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি সেই সূচকে সবার উপরে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশের পরে রয়েছে কম্বোডিয়া, কলম্বিয়া, মিশর, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্দোনেশিয়া ও ইসরায়েল। আর বিনিয়োগের ক্ষেত্রে যেসব গন্তব্য দেশের সুযোগ সবচেয়ে বেশি সেই তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান অষ্টম। অনেক দেশের বিনিয়োগকারীরা এখন এই বাজার ধরতে চান। ইআরইইউ এর প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, আগামী এক দশকে বাংলাদেশের মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠির আকার

পাঁচ কোটি ছাড়িয়ে যাবে।

ইআরইইউ এর এই প্রতিবেদন বলে দিচ্ছে বাংলাদেশ কতোটা গিয়েছে এবং কতোটা সম্ভাবনার দেশে পরিণত হয়েছে।

একটা দেশের উন্নয়নে বা উন্নতীতে নেতৃত্ব যে একটা বড় বিষয় তা বলার অপেক্ষা রাখে না। স্বাধীনতার মাত্র সাড়ে তিন বছরের মাথায় জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে স্বপরিবারে হত্যার পর প্রায় ৩০ বছর বাংলাদেশে পরিচালিত হয়েছিল ছিলো সামরিক শাসন আর স্বাধীনতা বিরোধীদের নেতৃত্বে। এই সময়টায় বাংলাদেশকে সব সময় দরিদ্র রাষ্ট্র হিসেবেই পরিচিত করে তোলা হয়েছিল গোটা বিশ্বে। যার ফলে বাংলাদেশ রাষ্ট্র তার কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছতে পারেনি।

কিন্তু গত প্রায় দেড় দশক ধরে দেশের নেতৃত্বে দিচ্ছেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। তার সুযোগ্য, বিচক্ষণ ও দৃঢ় নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্ব মানচিত্রে নতুন পরিচয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। একটি সমৃদ্ধ, সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে সবার কাছে পরিচিত হয়ে উঠেছে। এ কারণে আজ বিনিয়োগকারীরা ছুটে আসছেন বাংলাদেশে।

শুধু যে বিনিয়োগকারীরাই আসছেন তা নয়। বিশ্ব নেতাদেরও আগমন ঘটছে বাংলাদেশে। তেমনি ব্রিকস-এর মত শক্তিশালী অর্থনৈতিক জোটেও বাংলাদেশকে আমন্ত্রণ পেয়েছে। সর্বশেষ প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতের নয়া দিল্লীতে অনুষ্ঠিত জি-২০ সম্মেলনেও বাংলাদেশ ছিল আমন্ত্রিত। শুধু আমন্ত্রিতই নয় সম্মেলনে প্রায় সব অধিবেশনেই অংশ নিয়েছে বাংলাদেশ। সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। এই সম্মেলনে অংশ নিয়ে বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানের সঙ্গে দ্বি-পাক্ষিক বৈঠকও করেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে বাংলাদেশে বিশ্বের প্রভাবশালী অনেক দেশের নেতারা এসছেন। সর্বশেষ রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যাভরভ ঘুরে গেছেন। রবিবার ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী এ্যামানুয়েল ম্যাক্রো দুই দিনের সফরে ঢাকায় অবস্থান করছেন। তার এই সফরে দুই দেশের মধ্যে একাধিক বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরের কথা রয়েছে।

বিশ্ব নেতাদের এই সফর জিও পলিটিক্সে ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলের গুরুত্ব বাড়ছে। আর ইন্দোপ্যাসিফিকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দেশ হচ্ছে বাংলাদেশ। এখানে বাংলাদেশের অবস্থানও নিরপেক্ষ। বাংলাদেশ সরাসরি কোন ব্লকের সাথে সংযুক্ত নেই। এ কারণে যেমন চাপে আছে

বাংলাদেশ, তেমনি সবার লক্ষ্যবস্তুতেও পরিণত হয়েছে।

ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশের যোগ্য নেতৃত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে গত ২৯ আগস্ট “হিন্দুস্থান টাইমস” লিখেছে “দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় রাজনৈতিক স্থিরতা এবং আঞ্চলিক উগ্রবাদীতা প্রশমনে শেখ হাসিনার ভূমিকা অনস্বীকার্য। যারা শেখ হাসিনার উপর অনভিপ্রেত চাপ দেয়ার চেষ্টা করে আসলে তারা এই ইন্দো প্যাসিফিকের শান্তিকে বিনষ্ট করতে চায়”।

শেখ হাসিনার দৃঢ় নেতৃত্বের কারণে বাংলাদেশের আত্মমর্যাদার প্রতীক পদ্মা সেতুতে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়ন থেকে পিছিয়ে আসা, আমেরিকার ভিসা স্যাংশন নীতি, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য জাতিসংঘ, আমেরিকা, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের চাপ, মার্কিন সিনেটরদের বাংলাদেশের মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে চিঠি, জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার সুপারিশ করার এতো চাপ সত্ত্বেও কোন কিছু থেকেই পিচিয়ে যায়নি বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ‘কারো সঙ্গে বৈরিতা নয়, সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব’ পররাষ্ট্রনীতিতে অনড় রয়েছেন। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে সকল বিরূপ পরিস্থিতি মোকাবেলা করেছেন নিজের বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা দিয়ে। তাঁর এই সাহসিকতার প্রশংসা করেছেন রাশিয়ার সফররত পররাষ্ট্রমন্ত্রী ল্যাভারভ।

তিনি বলেছেন “যুক্তরাষ্ট্রের চাপ সত্ত্বেও বাংলাদেশের বন্ধুরা বিদেশি শক্তিকে মোকাবিলা করে নিজেদের জাতীয় স্বার্থে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি বজায় রেখেছে, যা প্রশংসার দাবী রাখে”। একই কথা বলেছেন বিশ্বের সবচেয়ে বড় অর্থনীতির দেশ চীনের প্রেসিডেন্ট শী জিনপিং।

বিশ্বনেতারা বাংলাদেশে গণতন্ত্রের স্বার্থে একটি সুষ্ঠু, অংশগ্রহণমূলক ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাইলেও, তারা ইন্দো প্যাসিফিক অঞ্চলে সহযোগি হিসেবে শেখ হাসিনাকেই চাইছেন। গত জুলাই মাসে বাংলাদেশে একটা জরিপ পরিচালনা করে আন্তর্জাতিক রিপাবলিকান এসোসিয়েশন নামে একটি আমেরিকান সংস্থা। তাদের জরিপেও উঠে আসে বিষয়টি, সরকারের অনেক কর্মকান্ড বিশেষ করে দুর্নীতি আর আইনশৃঙ্খলা বিষয়ে সমালোচনা করলেও ৯০শতাংশ জনগণ শেখ হাসিনার হাতেই নেতৃত্ব দেখতে চায়। শেখ হাসিনা শুধু নিজ দেশ বা আঞ্চলিক গন্ডিতেই না, উনি বিশ্ব পরিমণ্ডলে একজন প্রভাবশালী নেতা হয়ে উঠেছেন।

শেষ করতে চাই কানাডা প্রবাসী সাংবাদিক জসিম মল্লিক এর একটা ফেসবুক স্ঠ্যাটাস দিয়ে। রবিবার তিনি একটি স্ট্যাটাসে লিখেছেন, ‘ ‘অন্য জাতির লোকরা কখনও বাংলাদেশ নিয়ে নাক সিঁটকায় না যতটা আমরা নিজেরা সিঁটকাই। আমরা নিজেরাই নিজেদের ছোট করি। বিদেশে এসে দেশের বদনাম করি। দল করি। মিছিল মিটিং করি, মারপিট ঝগড়া ঝাটি করি। এই যে দেশ বিদেশে এক দেড় কোটি বাঙালি ছড়িয়ে আছে, মাথা উঁচু করে টিকে আছে সেটা কিভাবে হয়েছে! বাংলাদেশে নামটা এখন সবাই চেনে। সম্মান করে। ওয়েষ্ট আফ্রিকার দেশ বুরকিনা ফাচোর লোকেরাও জানে বাংলা নামের একটা দেশ আছে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে চেনে। শেখ হাসিনাকে চেনে। একজন মুজিব জন্মেছিলেন বলেই আমরা সবুজ পাসপোর্ট পেয়েছিলাম। তা না হলে আমরা থাকতাম পাকিস্তানীদের বুটের তলায়। আমাদের মতো অকৃতজ্ঞও পৃথিবীতে সম্ভবত দ্বিতীয়টি নাই। যার বা যাদের জন্যই করবেন দেখবেন তারাই চোখ উল্টে ফেলবে। যেনো এটাই নিয়ম। সেটা কি সংসারে, কি রাষ্ট্রে। আমি সারাজীবন যাদের জন্য করেছি তারা কেউই সেসব মনে রাখেনি। নূন্যতম কৃতজ্ঞতাবোধও নাই। কেউ কেউ মনে করে পাওয়াটা তাদের অধিকার। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলে চিনতেও কষ্ট হয়। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও এমনটা দেখা যায়। যেমন শেখ হাসিনা যে এতো করছেন এই দেশের জন্য তারপরও কিছু লোকের সেটা চোখে পড়ে না। ভাল লাগে না। কৃতঘ্ন বলেই বঙ্গবন্ধুকে সপারিবারে হত্যা করতে পারে। আচ্ছা শেখ হাসিনার অপরাধটা কোথায় যে জন্য তাঁকে টেনে হিচরে ক্ষমতা থেকে নামাতে হবে!’’

১৯৮৬ নির্বাচন: সংবিধান পরিবর্তন ও দীর্ঘমেয়াদী নীলনকশা

বঙ্গবন্ধুকে নির্মমভাবে হত্যা করার পর অবৈধভাবে ক্ষমতা দখল করে জিয়াউর রহমান। স্বাধীনতা বিরোধী এবং পাকিস্তান সরকারের প্রতি অনুগতদের মন্ত্রিসভায় স্থান দেয়া হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে চট্টগ্রামে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তাকে হত্যা করা হয়। এক বছরের

কম সময়ের মধ্যে লেফটেন্যান্ট জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করেন। অন্য সামরিক শাসনের মত এরশাদও বৈধতার সঙ্কট অতিক্রমের জন্য বেসমারিকিকরণের বিভিন্ন প্রক্রিয়া অনুসরণ করেন।

স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন এবং জাতীয় পার্টির সৃষ্টি
সামরিক শাসক হিসাবে ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকে নানাবিধ আন্দোলন সংগ্রামের সম্মুখীন হন হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ। গ্রহণযোগ্যতা তৈরি ও গণতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য সময়ক্ষেপণের লক্ষ্যে প্রথমে তিনি বিভিন্ন স্থানীয় সরকার নির্বাচন করেন। ১৯৮৩ সালের ডিসেম্বরে ইউনিয়ন পরিষদ এবং ১৯৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পৌরসভা ও মিউনিসিপ্যাল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

রাজনীতিতে ক্ষমতা পাকাপোক্ত করতে, পূর্বসুরি সামরিক শাসকের অনুকরণে ভিতরে ভিতরে নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য কলকাঠি নাড়তে থাকেন। রাজনৈতিক দল গঠন প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য ১৯৮৪ সালের এপ্রিলে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক কর্মসূচি পরিচালনার অনুমতি দেন এরশাদ। ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি জাতীয় পার্টি নামে রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু সাধারণ জনগণ, সর্বদলীয় ছাত্রঐক্য এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যেতে থাকে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে নিজ অবস্থানের ম্যান্ডেট নেবার জন্য ১৯৮৫ সালের ২১ মার্চ গণভোটের আয়োজন করেন। এই গণভোটে সব ধরনের কারচুপি করে ৯৪.১৪ ভাগ আস্থা ভোট লাভ করেন এরশাদ।

বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর আন্দোলনের মুখে তিন দফা জাতীয় সংসদ নির্বাচনের তারিখ পরিবর্তন হয়। নির্বাচনের তারিখ প্রথমে ঘোষিত হয় ১৯৮৪ সালের ২৬ এপ্রিল। অবশেষে ১৯৮৬ সালের ৭ মে তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, জামায়াতে ইসলামী, মুসলিম লীগসহ ছোট-বড় ২৮টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। নির্বাচনে ৩০০ আসনের জন্য ২১৫৪ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ১৫২৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। এর মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ৪৫৩ জন। নির্বাচনে মোট ভোটার ছিল ৪ কোটি ৭৮ লক্ষ ৭৬ হাজার ৯৭৯ জন। এ নির্বাচনের উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল বিএনপি নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোটের নির্বাচন বর্জন।

সংবিধান পরিবর্তন
আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোন শক্ত প্রতিরোধ সংসদে না থাকায় এরশাদকে

একপ্রকার সাহসী করে তোলে। নিজস্ব এজেন্ডা, জনগণকে প্ররোচিত করার লক্ষ্যে দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা হিসাবে ধর্মীয় আড়ালে নিজের ক্ষমতা পাকাপোক্ত করার চেষ্টা করে। যা তিনি পূর্বসুরি জিয়াউর রহমানের ক্ষমতাকালীন সময়ে দেখেছেন এবং শিখেছেন। জিয়া হত্যার সাজানো অভিযোগে সামরিক বাহিনীর শেষ মুক্তিযোদ্ধাপন্থী গ্রুপের ১৩ জনকে হত্যা করে নিজেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে নিয়ে যান এরশাদ। প্রেসিডেন্ট হুসেইন মুহাম্মদ এরশাদ রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনা করার সময় রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় আবেগকে আরো বেগবান করার লক্ষ্যে ১৯৮৮ সালে সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী আনেন। যেখানে ‘বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম’ অটুট রাখেন এবং ‘রাষ্ট্রধর্ম’ নামে নতুন একটি অনুচ্ছেদ-২ক যুক্ত করেন।

ওই বছরই এর বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে ‘স্বৈরাচার ও সাম্প্রদায়িকতা প্রতিরোধ কমিটি’র ১৫ জন বিশিষ্ট নাগরিকের পক্ষে সুপ্রিম কোর্টের সিনিয়র আইনজীবী সুব্রত চৌধুরী উচ্চ আদালতে একটি রীট পিটিশন দাখিল করেন। রীট নাম্বার-১৪৩৪/১৯৮৮। যথেষ্ট সময় ক্ষেপণের পর এবং বাংলাদেশের যথেষ্ঠ রাজনৈতিক পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে ১৯৮৮ সালের করা রীট আবেদনের সঙ্গে ২৩ বছর পর অর্থাৎ ২০১১ সালে একটি সম্পূরক আবেদন দাখিল করা হয়। উক্ত সম্পূরক আবেদনের ওপর শুনানি শেষে ওই বছরের ৮ জুন বিচারপতি এ এইচ এম শামসুদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বাধীন হাইকোর্ট বেঞ্চ রুল জারি করেন।

১৯৮৬ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাথে বিএনপি বিরোধীদলে থাকলে এতো বড় সাহস এরশাদ পেতেন না। আওয়ামী লীগ বরাবরই গণতন্ত্রপন্থী ও নির্বাচনমুখী একটি দল, শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ চেয়েছিল নির্বাচনের ম্যান্ডেটের মাধ্যমে স্বৈরাশাসককে জবাব দিতে। কিন্তু কোন এক দুরভিসন্ধি থেকে অথবা জিয়া হত্যায় ১৩ জনকে ফাঁসিতে ঝুলানোর কৃতজ্ঞতা থেকে হয়তো বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়া সেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেনি। এই কারণে উনাকে “আপোষহীন নেত্রী” উপাধি দেয় দলের লোকজন। কিন্তু এই তথাকথিত আপোষহীন নেত্রী সেদিন স্বৈরশাসককে যে ক্লিনশিট দিয়েছিল, যেভাবে গণতন্ত্রকামী এরশাদবিরোধী অন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত দলগুলোকে ছেড়ে গিয়েছিল, সেটাই বাংলাদেশের রাজনীতির গতিপথ পরিবর্তনের সবচেয়ে বড় নিয়ামক হিসাবে কাজ করেছে। সেটাই ছিল ৭২’এর সংবিধানের উপর দ্বিতীয় পেরেক, যার প্রথমটি গেঁথেছিলেন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। সেই পরিবর্তনের ক্রমধারায় বাংলাদেশে ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল, সংগঠন, মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, মাদ্রাসাশিক্ষার নামে পাকিস্থানি, তালেবানি,

আরবী সংস্কৃতি আমদানী করে আর বাংলাদেশ পিছিয়ে যেতে থাকে।

দীর্ঘমেয়াদী নীলনকশা
ধর্মকে ব্যবহার করে রাজনীতির খেলা, যার শুরুটা করেছিলেন সামরিক শাসক জিয়াউর রহমান। যার পূর্ণতা দিয়েছিল স্বৈরশাসক এরশাদ, তার সবচেয়ে বড় সুবিধাভোগী পরবর্তীতে হয়েছিল বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। পূর্বজদের লিগ্যাসিকে সফলভাবে বাংলাদেশের সংবিধান ও জনগণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে গেঁথে দিতে সফলকাম হয়েছিল বিএনপি। যার ক্রমবিবর্তনের ধারায় বাংলাদেশে মৌলবাদ, জঙ্গিবাদ, ধর্মবাদ বিস্তৃতি লাভ করেছে।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

জিয়ার ‘হ্যাঁ-না’ ভোট: নির্বাচন ব্যবস্থা সর্বনাশের সূত্রপাত

বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর বাংলাদেশের শাসন ক্ষমতা বৈধ গণতান্ত্রিক কর্তৃপক্ষের হাত থেকে অবৈধ ক্ষমতা দখলদার সেনা শাসকদের হাতে চলে যায়। তারা নেতৃত্বের দায়িত্ব দেয় সে সময়ের আর্মি চিফ অব স্টাফ মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানের উপর। জিয়ার তখন মূল অ্যসাইন্টমেন্ট খুনিদের বাঁচানো। এর জন্যে দরকার ছিল ক্ষমতা টিকিয়ে রাখা। এজন্য তিনি ক্ষমতায় থেকে দল গঠন এবং একের পর এক নির্বাচন দিয়ে ক্ষমতা বৈধ করার চেষ্টা করতে থাকেন। এর যেসব রাজনৈতিক অস্ত্র ব্যবহার করতে থাকেন তার নির্বাচন ছিল অন্যতম। চলুন পাঠন আমরা দেখে নেই কেমন ছিল সেই নির্বাচনগুলো।

হ্যাঁ / না ভোট আয়োজন, ১৯৭৭ সাল
জিয়াউর রহমান তখন একইসাথে দেশের রাষ্ট্রপতি,সেনা প্রধান এবং প্রধান সামরিক আইন শাসক। সেনাবাহিনীতে তাঁকে চ্যালেঞ্জ করার কেউ নেই। দেশের ভেতরে রাজনৈতিক বিরোধীরা বিচ্ছিন্ন এবং দিশেহারা। তারপরেও জিয়াউর রহমানকে প্রমাণ করতে হবে, তার জনসমর্থন আছে। শুধু

বন্দুকের জোরে তিনি ক্ষমতায় বসেননি। তাই ১৯৭৭ সালের ৩০ মে তার রাষ্ট্রপতি নিয়োগের বৈধতার জন্য প্রথমেই আয়োজন করে হ্যাঁ/না ভোটের। মূলত এই হ্যাঁ/না ভোটের মাধ্যমেই বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়া শুরু হয়। এতে ভোটার উপস্থিতি ২ শতাংশের নিচে হলেও দেখানো হয়েছিল ৮৮ শতাং শ। আর প্রদত্ত ভোটের ৯৮ শতাংশই দেখানো হয় জিয়ার পক্ষে।

১৯৭৮এ অনিয়মে ভরা রাষ্ট্রপতি নির্বাচন
২১ এপ্রিল,১৯৭৮ তারিখে জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করলেন। নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণ হয় ৩ জুন, ১৯৭৮। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে জিয়া ছিলেন জাতীয়তাবাদী জোটের প্রার্থী। তার প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন গণঐক্য জোটের প্রার্থী অবসর প্রাপ্ত জেনারেল এম এ জি ওসমানী। অথচ বাংলাদেশের আর্মি অ্যক্টের ২৯২,২৯৩ বিধিতে ছিল, সামরিক বাহিনীর কোন সদস্য তার চাকরির মেয়াদ শেষ না করে নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না । এছাড়া রাষ্ট্রপতি নির্বাচন অধ্যাদেশ অনুযায়ী কোন সরকারি চাকরিজীবী ও সরকারি বেতন গ্রহিতার রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে প্রার্থী হবার সুযোগ ছিল না। কিন্তু জিয়া সব আইন ভঙ্গ করে ১৯৭৮ সালের ৩জুন নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে।

সেসময়কার গণমাধ্যমের তথ্য অনুযায়ী সেনাবাহিনী, পুলিশ এবং সরকারি চাকরিজীবীদের জিয়ার পক্ষ নিতে বাধ্য করা হয়। সরকারের তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে ছাপানো জিয়ার নির্বাচনী পোস্টারে পুরো দেশ ছেয়ে যায়। সরকারি গণমাধ্যমে ঢাকঢোল পিটিয়ে তার নির্বাচনী সমাবেশের খবর প্রচার করে।

অপর প্রার্থী ওসমানী অভিযোগ করেন, গণমাধ্যমে তার বক্তব্য বিকৃতভাবে হয়। তাকে নিয়ে একের পর এক ভিত্তিহীন রিপোর্ট প্রকাশ হয় সরকার নিয়ন্ত্রিত পত্রিকায়। এই নির্বাচনে গণঐক্য জোটের ৪০জন কর্মীকে হত্যার অভিযোগ ওঠে। সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের হামলা তথ্য পাওয়া যায় ২০০টির বেশি কেন্দ্রে। পোলিং এজেন্ট আর নির্বাচনী পর্যবেক্ষকদের বের করে দেয় সংবাদ ছাপা হয় দেশি পত্র-পত্রিকায়।

নির্বাচন কাভার করতে আসা নিউইয়র্ক টাইমসের সাংবাদিক উইলিয়াম বর্ডার ১৯৭৮ সালের ৪ জুন প্রকাশিত রিপোর্টে প্রচুর জাল ভোট আর প্রতিপক্ষ এজেন্টদের নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে বের করে দেবার খবর এবং ছবি ছাপে। তার পরেও শতকরা ৭৬ ভাগ ভোট দেখিয়ে রাষ্ট্রপতি হন জিয়া।

প্রশ্নবিদ্ধ ১৯৭৯ সালের নির্বাচন
১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জিয়াউর রহমান তার একক নেতৃত্বে রাজনৈতিক দল বিএনপি গঠন করেছিলেন। তার সামরিক ক্ষমতা বেসামরিক মোড়ক পরিয়ে পাকাপোক্তভাবে পরিচালনা করার জন্য ১৯৭৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঘোষণা দেন জিয়াউর রহমান। আবদুল মালেক উকিলের নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এই নির্বাচনে ছিল তার প্রধান প্রতিপক্ষ।

১৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়। নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি ও দুর্নীতির অভিযোগ ওই সময়ের কোন কোন গণমাধ্যম প্রকাশ করে। অভিযোগ আসে গুণ্ডা বাহিনীর কেন্দ্র দখলের। পাশাপাশি সেনাবাহিনীসহ সরকারি কর্মকর্তাদের প্রমাণ পাওয়া যায়। আওয়ামী লীগ প্রার্থী এবং নেতা কর্মীদের উপর চালানো হয় অত্যাচর ।

সংবিধান লঙ্ঘন করে মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলাম, পিডিবি এবং নেজামে ইসলামের যুদ্ধাপরাধীদের নতুন জোট ইসলামিক ডেমোক্রেটিক লীগকে নির্বাচনে অংশ নেয়ার সুযোগ দেয়া হয়। কারচুপির সুযোগ দিয়ে তাদেরকেও ২০টি আসনে জয়ী দেখানো হয়। জিয়ার বিএনপিকে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে ২০৭টি আসনে বিজয়ী ঘোষণা করে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলেন, ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধে যে সাম্প্রদায়িক ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে কবর দেয়া হয়েছিল, জিয়া তা কবর থেকে তুলে এনে নতুন জীবন দিয়েছিলেন। বিএনপির মনোনয়নে বিপুল সংখ্যক দালাল ও স্বাধীনতা বিরোধীকে বিজয়ী করে জাতীয় সংসদে আনা হয়। রাজাকারদের পবিত্র সংসদে ঢোকার সুযোগ করে দেন জিয়া।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করা এবং পাকিস্তানের পক্ষে বিশ্বজনমত সৃষ্টির জন্য জাতিসংঘে ছুটে যাওয়া শাহ আজিজুর রহমান এবং রাজিয়া ফয়েজের মত কুখ্যাত রাজাকারদের জিয়াউর রহমান ভোটকারচুপির মাধ্যমে জিতিয়ে এনেছিলেন সে নির্বাচনে।

ড. ইউনূসের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও নাগরিক শক্তির মৃত্যু

প্রতিবছর পৃথিবীর নানা দেশ তাদের ভালো কাজগুলোর স্বীকৃতি হিসেবে নোবেল পুরস্কার পাওয়ার অপেক্ষা করে। সেইসব ভালো ও কার্যকর আবিস্কার ও সামাজিক কাজগুলোকে এগিয়ে নিতে নানা পৃষ্ঠপোষকতাও করে। এটি এক অনন্য সম্মান। সেই সম্মান বাংলাদেশের ঘরে আসার পরেও হোঁচট খেয়েছিলো।

হ্যাঁ, কথা হচ্ছিলো ড. ইউনুসকে নিয়ে। নোবেল পেয়ে তিনি নিজেকে তার যোগ্য করে প্রকাশ করতে না পেরে পরিচিতি পেয়েছিলেন নেতিবাচক নানা তকমায়। ২০০৭ সাল সেটাকে ত্বরান্বিত করেছিলো। বাংলাদেশের গণতন্ত্রের ইতিহাসে ২০০৭ সালের সেনাসমর্থিত তত্ত্বাবধায়কের সময়টা ছিলো কালো অধ্যায়। একদল মানুষ রাজনীতিতে সংস্কার আনার নামে দেশকে বিরাজনীতিকরণের দিকে ঠেলে দিতে চেয়েছিলো প্রধান দুই দলকে নিস্ক্রিয় করার মাধ্যমে। সেই সময়টাকে স্বর্ণমুহুর্ত হিসেবে লুফে নেন ড. ইউনুস তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে এগিয়ে নিতে। ঘোষণা দেন – তার নেতৃত্বে নতুন এক রাজনৈতিক দল হবে, যার নাম হবে নাগরিক শক্তি।

বেশিদিন সময় নেননি তিনি। নোবেল পুরষ্কার লাভ করার মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যেই রাজনৈতিক দল গঠন করার কার্যক্রম শুরু করে সবাইকে অবাক করে দিয়েছিলেন তিনি। সেসব দিন আমরা যারা ভুলে গেছি তারা আরেকবার স্মরণ করি এই মানুষটির শিখরে ওঠার আকাঙ্ক্ষাকে।

শোনা যায়, সেই আকাঙ্ক্ষার জায়গা এতোই প্রকট ছিলো যে ফখরুদ্দিন আহমদকে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রধান করার আগে সেনাবাহিনীর তরফ থেকে অধ্যাপক ইউনূসকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। সেটিও তিনি ফিরিয়ে দেন। কোন সৎ উদ্দেশ্য থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন এমন নয়। কেনো করেছিলেন এমন? হিসেব ছিলো পরিস্কার। স্বল্প মেয়াদী সরকার হওয়ায় কেয়ারটেকার প্রধান হওয়ার প্রস্তাবে রাজি হননি ড. ইউনূস। তার স্বপ্ন ছিল দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকা। আর এ জন্য ‘নাগরিক শক্তি’ নামে নতুন দল গঠনও করেছিলেন।

তারপর কী হলো? সেই দল কোথায় গেলো। তার উদ্দেশ্য যে সৎ ছিলো না তা নাগরিক শক্তির ঘোষণা ও সাগরিক শক্তি না করার ঘোষণা দুটো

থেকেই স্পষ্ট হয়। চলুন পিছনে ফিরে যাই। ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসের শেষের দিকে অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস ভারত সফরে যান। সে সফরে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবার জোরালো সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন। ৩১শে জানুয়ারি দিল্লীতে এক সংবাদ সম্মেলনে অধ্যাপক ইউনূস বলেন, দেশের পরিস্থিতি বাধ্য করলে তিনি রাজনীতিতে যোগ দেবেন। দেশকে উদ্ধারের প্রকল্প নিয়ে হাজির হওয়া ইউনুস বলেছিলেন, রাজনীতিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করার মতো ব্যক্তি আমি নই। কিন্তু পরিস্থিতি যদি বাধ্য করে তাহলে রাজনীতিতে যোগ দিতে আমি দ্বিধা করবো না।

নাগরিক শক্তির মৃত্যু ঘটেছিলো ইউনুসের হাত ধরেই। ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত দুই নেত্রীকে রাজনীতি থেকে বাইরে রাখা কিংবা বিদেশে পাঠিয়ে দেবার নানা চেষ্টা অব্যাহত রেখেছিল সেনা-সমর্থিত তত্ত্বাবধায়ক সরকার। অধ্যাপক ইউনূস সে পরিস্থিতির সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন মাত্র। তিনি ঘোষণা দিয়েও সামাল দিতে পারেননি। এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে এসে মোটামুটি পরিষ্কার হয়ে যায় যে শেখ হাসিনা ও খালেদা জিয়াকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা সম্ভব হবে না। সে পরিস্থিতিতে ডঃ ইউনুস নিজস্ব রাজনৈতিক দল গঠনের বিষয়ে একটু দ্বিধায় পড়ে যান।

অনেকের সঙ্গে দল নিয়ে আলাপ করলেও তিনি গ্রীনসিগন্যাল পাননি। ফলে ২০০৭ সালের ৩রা মে অধ্যাপক ইউনূস রাজনৈতিক দল গঠনের প্রক্রিয়া থেকে সরে আসার ঘোষণা দেন। রাজনীতিতে আসার জন্য তিনি জনগণের উদ্দেশ্যে যে খোলা চিঠি দিয়েছিলেন তার তিনমাসের মধ্যেই সে প্রক্রিয়া থেকে সরে আসেন অধ্যাপক মুহাম্মদ ইউনূস।
এবং তার সেই নাটকের জবনিকাপাত ঘটেছিলো আবারও একটি খোলা চিঠি দিয়েই। এজন্য তিনি জাতির উদ্দেশ্যে একটি চিঠি প্রকাশ করেন। তিনি জাতির উদ্দেশ্যে সে চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেন, “যাদেরকে সঙ্গে পেলে দল গঠন করে জনগণের সামনে সবল ও উজ্জ্বল বিকল্প রাখা সম্ভব হতো তাদের আমি পাচ্ছি না। আর যারা রাজনৈতিক দলে আছেন তারা দল ছেড়ে আসবেন না। বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে এ পথে অগ্রসর না হওয়াই সঠিক হবে মনে করে এ প্রচেষ্টা থেকে সরে আসার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’

এই যে রাজনৈতিক দল করার আকাঙ্ক্ষা এবং যথেষ্ট সাড়া না পেয়ে পিছিয়ে পড়া সেখানো কোথাও ড. ইউনুস নিজেকে সমালোচনা করেননি। তার মতো একজন ব্যক্তির সেটাই করার কথা ছিলো। কেনো তিনি যথেষ্ট সাড়া পেলেন না সেখানেও তিনি কখনওই নিজের কমতি দেখতে পাননি। সবসময়েই তিনি অন্যের ওপর দোষ চাপিয়ে দিয়ে পাশ কাটিয়ে চলেছেন। কখনও দোষ জনগনের, যারা তার উদ্দেশ্য বুঝতে অক্ষম ছিলো, কখনও

দোষ মাঠের রাজনীতিবিদদের, যারা তার ষড়যন্ত্রে যোগ দিতে রাজি হননি, কখনও দোষ সময়ের, যে সময়ে ‘ফাঁকা মাঠেও’ তিনি গোল দিতে পারেননি।

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।

ধর্মীয় সংখ্যালঘু নির্যাতন বেশি বিএনপি-জামায়াত আমলেই

“বাবারা, আমার মেয়েটা ছোট, তোমরা একজন একজন করে এসো, নইলে ও মরে যাবে।” ১৩ শব্দের বাক্যে একজন মায়ের আকুতি কী আমরা ভুলে গেছি। সন্তানের উপর কোতোটা বরবর নির্যাতন হলে একজন মা এভাবে আকুতে জানাতে পারে? কিন্তু মায়ের চোখের জল আর গগন বিদারী আহাজারীতেও নরপিশাচদের এতোটুকু মন গলেনি।

পূর্ণিমা রাণী শীলের বাড়ি সিরাজগঞ্জের উল্লাপড়ায়। ২০০১ সালে পূর্ণিমার বয়স মাত্র তেরো বছর। অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সে। গ্রামের ৮-১০টি কিশোরীর মতো উচ্ছল চঞ্চল প্রাণে বেড়ে উঠছিল। কিন্তু ১৩ বছর বয়সে, ২০০১ সালের ৮ অক্টোবর তার জীবনে নেমে আসে কালো অন্ধকার। তছনছ করে দেয় তার তারুণ্যে ভরা জীবনকে। সেই রাতে পূর্ণিমার বাড়িতে হামলা চালায় বিএনপি-জামাতের নেতাকর্মীরা। এরপর পূর্ণিমা আর তার মা’কে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় বাড়ির পাশের একটি ক্ষেতে। পনেরো থেকে বিশজন বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডার ধর্ষণ করে কিশোরী পূর্ণিমাকে। মায়ের সামনেই মেয়ের ছোট্ট শরীরটার ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল নরপিশাচের দল। কান্না করতে করতে পশুগুলোর কাছে মিনতি করছিলেন মা। বলছিলেন, “বাবারা, আমার মেয়েটা ছোট তোমরা একজন একজন করে এসো, নইলে ও মরে যাবে।”

ছবি রানীর বাড়ি বাগেরহাটের রামপালে। ২০০২ সালের ২১ শে আগস্ট তৎকালীন বিএনপি-জামায়াত জোট বাহিনীর নেতাকর্মীদের গণধর্ষণের শিকার হন তিনি। বাসস্ট্যন্ড থেকে ছবি রানীর কাপড় খুলে ফেলে বিএনপি-জামায়াতের ক্যাডারবাহিনী। তাকে নিয়ে যাওয়া হয় বিএনপি অফিসে। এরপর পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করা হয়। নরপিশাচরা শুধু ধর্ষণ

করেই ক্ষান্ত হয়নি, ছবি রানীর গোপন অঙ্গে মরিচের গুড়া, বালি আর কাচের গুড়া ঢুকিয়ে নির্যাতন করে।

২০০১ সালের ১৬ নভেম্বর ভোলা জেলার চরফ্যাসন উপজেলায় বিএনপি নেতাকর্মীরা ২০০ হিন্দু নারীকে গণধর্ষণ করে। সবচেয়ে ছোট ভিকটিমের বয়স ছিল 8 বছর আর সবচেয়ে বড়টির বয়স ছিল ৭০ বছর। অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর সারাদেশে এমন কয়েকশ’ ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে। চক্ষুলজ্জা আর প্রাণের ভয়ে অনেক তা প্রকাশ্যে আসেনি। তাদের সবার অপরাধ ছিল, তারা ধর্মীয় সংখ্যালঘু এবং তারা বঙ্গবন্ধুর নৌকার সমর্থক।

২০০১ সালের নির্বাচনে জয়লাভের পর থেকেই সনাতন ধর্মালম্বীদের উপর হামলা শুরু হয়, যা চলে পরবর্তী পাঁচ বছর। বাগেরহাট, বরিশাল, ভোলা, বগুড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, চট্টগ্রাম, ফেনী, গাজীপুর, ঝিনাইদহ, যশোর, খুলনা, কুষ্টিয়া, মুন্সিগঞ্জ, নাটোর, পিরোজপুর, সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষীরা, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ জেলায় হিন্দুদের উপর পরিকল্পিত হামলা হয়। দ্বীপ জেলা ভোলায় প্রায় দুই মাস ধরে ধর্মীয় সংখ্যালঘু পরিবারের উপর নির্যাতন চলে। যোগাযোগব্যবস্থা খারাপ থাকায় প্রশাসনের লোকজন এমনকি সংবাদকর্মীরাও নির্যাতনের সঠিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারেনি। সেসময় সারাদেশে বাড়িঘর লুটপাট, বাড়ি থেকে উচ্ছেদের মতো অজস্র ঘটনা ঘটে। এসবের অধিকাংশই পুলিশের নথিভুক্ত হয়নি। ভুক্তভুগীরা ভয়ে কোন অভিযোগ পর্যন্ত করেননি।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের হিসাব বলছে, ১৯৯৬, ২০০১ বা তার আগের প্রতিটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ঠিক পরের বছরে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, ধর্ষণ ও ধর্ষণ চেষ্টা বেশি। শুধু ব্যতিক্রম চিত্র দেখা যায় ২০০৮ সালের নির্বাচনের পর। ১৯৯৬ এর নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২১৪টি, পরের বছরে ৫৫৪টি । ২০০১ সালে ধর্ষণের ঘটনা ৫৬৬টি হলেও পরের বছরে তা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯১টিতে। ২০১৪ সালে নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে ৫৪৫টি, পরের বছরে এ সংখ্যা ছিল ৬৯০। ২০১৮ সালে নির্বাচনের বছরে ধর্ষণের ঘটনা ৫৫৬টি, পরের বছরে তা দাঁড়ায় ১ হাজার ৯৭টিতে।

২০০৯ সালে আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতায় আসার পর নির্যাতনের ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করে শাস্তি নিশ্চিত করার জন্য ‘হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ’ নামে একটি সংগঠন হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন দায়ের করে। হাইকোর্ট এক আদেশে নির্যাতনের ঘটনা তদন্তে

একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশন গঠনের নির্দেশ দেন। এক বছরের বেশি সময় তদন্ত শেষে ২০১১ সালের ২৪ এপ্রিল সরকারকে ৫ খণ্ডের ১ হাজার ১০০ পৃষ্ঠার প্রতিবেদন জমা দেয় কমিশন। প্রতিবেদনে দোষীদের চিহ্নিত করা এবং নির্যাতন প্রতিরোধে বেশ কিছু সুপারিশ করা হয়। পরবর্তী সময়ে এই প্রতিবেদন জনসম্মুখে প্রকাশের নির্দেশনা চেয়ে হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড পিস ফর বাংলাদেশ হাইকোর্টে আরেকটি রিট দায়ের করলে আদালতের নির্দেশ মোতাবেক প্রতিবেদন ২০২২ সালের ১ এপ্রিল গেজেট আকারে প্রকাশিত হয়।

তদন্ত কমিশনের ওই প্রতিবেদনে নির্বাচন-পরবর্তী সহিংসতায় ঢাকায় ২৭৬টি, চট্টগ্রামে ৪৯৭টি, সিলেটে ১৭টি, খুলনায় ৪৭৮টি, রাজশাহীতে ১৭০টি এবং বরিশালে সর্বাধিক ২ হাজার ২২৭টি ঘটনার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ৯২টি হত্যা, ১৮৪টি ধর্ষণ-সংঘবদ্ধ ধর্ষণের ঘটনারও উল্লেখ আছে।

জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর বারবার ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা কেন নিযাতনের শিকার হন? বাংলাদেশে সংখ্যালঘু ভোটারের সংখ্যা শতকরা ১০ ভাগ। নির্বাচনের মাঠে এই ১০ ভাগ ভোটারই জয় পারাজয়ে অনেক বড় একটা ভূমিকা পালন করে। সংখ্যালঘু ভোটারদেরকে বলা হয়, আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক। যদিও গবেষণায় দেখা যায়, সংখ্যালঘু ভোটাররা সব সময় যে একটা দলের পক্ষে ভোট দিয়েছে বা আনুগত্য প্রকাশ করেছে বিষয়টি এমন নয়। বাংলাদেশের বিভক্ত রাজনীতিতে সংখ্যালঘু ভোটারদের ভোটও বিভক্ত হয়ে পরে এবং কোন দলের প্রতি তাদের সমর্থনও প্রত্যাহার করে। সুতরাং সংখ্যালঘু ভোটার মানেই আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক এই বাস্তবতা সত্য নয়। কিন্তু বিএনপি-জামায়াতের প্রথম হামলার শিকার হন ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা।

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর থেকে আওয়ামী নেতৃত্ব মুছে ফেলা এবং যুদ্ধপরাধীদের পুনর্বাসনের মাধ্যমে পাকিস্থানের পাকিস্তানের মতো বাংলাদেশ থেকে সনাতন ধর্বলম্বীদের সমূলে উৎখাতের চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে জামায়াত-বিএনপি জোট। তাই প্রতিবার নির্বাচনে তারা হারলে বা জিতলেও সবচেয়ে বড় আক্রোশ মিটিয়েছে হিন্দুদের নির্যাতন, ধর্ষণ আর দেশ থেকে থেকে বিতাড়িত করে।

তবে এখন আর ভয় পাওয়ার সময় নেই। রুখে দিতে হবে নরপশুদের। আত্মবিশ্বাস নিয়ে নিজেদের দাঁড়াতে হবে। কারণ এই দেশটি সবার। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আশ্বস্ত করেছেন। তিনি বলেছেন,

‘নিজেদের সংখ্যালঘু মনে না করে, মনে করবেন আপনারা এই দেশেরই নাগরিক। সমান নাগরিক অধিকার আপনারা ভোগ কখনো নিজেদের মনে হীনম্মন্যতা নিয়ে আসবেন না।’

লেখক: গণমাধ্যমকর্মী।